OPEN ACCESS

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 01
Website: https://tirj.org.in, Page No. 01 - 05
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 01 - 05
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

লোকক্রীড়া ও নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্প

প্রিয়াঙ্কা মৈত্র
গবেষক, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : priyankamaitra103@gmail.com
ও
অধ্যাপক সুনিমা ঘোষ
বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Sports,
Folk,
Heritage,
History,
Human life,
Literature.

Abstract
Sports is the part of our human life.It carries emotion,love and nationalism for ages. In short,we can say that every Sports has their own heritage and Literature is created based on these sports. Usually sports or play was used as reference or context in ancient and medieval ages of Bengali literature. Post independence period it become a main force of bengali story. Except cricket, football or swimming there are more Sports of folk people which is the root of Indian culture. Here we are discuss about our folk sports oriented selected stories in various way and also try to proov that where every single sports or play is become a part of our life.

Discussion

'ক্রীড়া' শব্দটির প্রতিশব্দ খেলা। মানুষের আনন্দের প্রতি অপার আকর্ষণের ফলস্বরূপই বিভিন্ন খেলার সূত্রপাত। একটি শিশু জন্মের পর থেকেই হাসি আর আনন্দের হাত ধরে যেমন বড় হয়ে ওঠে তেমনি সমাজের সঙ্গেও তার পরিচিতিকরণ ঘটে। শিশুর জগৎ আনন্দের জগৎ, অবাধ কল্পনায় বিচরণের জগৎ। বাংলার এই লোকক্রীড়ার জগতেও নিয়ম নীতি অপেক্ষা আনন্দের ভাগ বেশি। বর্তমানের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের সুনির্দিষ্ট নিয়মাবদ্ধ খেলাগুলির সঙ্গে এর প্রভেদ অনেক। এখানে প্রতিযোগিতার আবহাওয়া কম এবং মানসিক স্বাস্থ্যবিধানের পরিধি বিস্তৃত। জেতা-হারার সমীকরণের বাইরে বেরিয়ে ছেলেবেলাকে উপভোগের অন্যতম মাধ্যম এই লোকক্রীড়াগুলি। সমাজ বা স্থানভেদে খেলাগুলির ধরনের কিছুটা বদল ঘটলেও মূল চরিত্রের বদল ঘটে না। সেদিক থেকে খেলাগুলি যুগ যুগ ধরে প্রবাহমান মানুষ ও লোকজ সমাজের ঐতিহ্যকে বহন করে চলে।[১]

মানুষ স্বতোপ্রণোদিত হয়ে নিজস্ব ইচ্ছা অনুসারে আনন্দ লাভের জন্য যা করে থাকে তাই সাধারণভাবে খেলা। শিশুদের পছন্দের খেলা সেটাই যাতে নিয়ম-নীতির প্রাচুর্য কম, নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই এবং যে খেলার কোন শেষ নেই। গ্রাম বাংলার লোক জীবন থেকে উদ্ভূত এই লোকক্রীড়াগুলি সেই কারণেই শিশুদের প্রাণের দোসর। লোকক্রীড়ার উপাদানগুলিও সুলভ এবং একান্ত ভাবে দেশীয়। যেমন— লাঠি, নুড়ি, পাতা প্রভৃতি। বস্তুগুলি লোকক্রীড়ার জগতে প্রবেশ

করে প্রাণরূপ ধারণ করে। লোকক্রীড়ার অন্দরে রয়েছে জীবন অনুকৃতি ও সমাজ ইতিহাসের ছাপ। সাধারণ জীবনের দুঃখ, আনন্দ, হাসি, কান্না, রাগ, অনুরাগ, কলহ, ক্ষয়, ক্ষতি, প্রাপ্তি, বেদনা সমৃদ্ধ প্রাত্যহিক জীবন যাপনের কর্মকাণ্ড গুলি লোকক্রীড়ায় অনূদিত হয় খেলার নিজস্ব ভাষা ও ছন্দে।[২]

বাংলা সাহিত্য বাঁক বদল করেছে বারবার। প্রতিটি বাঁকেই সে সমৃদ্ধ হয়েছে বিভিন্ন ভাবে। এরকমই একটি বাঁক বদল আমরা বলতে পারি ক্রীড়াকেন্দ্রিক সাহিত্য রচনার ধারা। মোটামুটি ভাবে প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা সাহিত্যে ক্রীড়া অনুষঙ্গ ও ক্রীড়া প্রসঙ্গ ব্যবহৃত হয়ে আসছে। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি চর্যাপদের দাবা খেলা, মহাভারতে পাশা খেলা, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বিভিন্ন লোকক্রীড়ার উল্লেখ বর্তমান। অর্থাৎ প্রাচীনকাল থেকেই ক্রীড়া জনপ্রিয় একটি উপাদান। তবে এই উপাদানকে কেন্দ্র করে মূল ধারার সাহিত্য রচনার প্রবণতা বাংলা সাহিত্যে বিরল। অথচ ক্রীড়া বিরাট একটি কর্মকাণ্ড। ক্রীড়াকে কেন্দ্র করে একাধারে মানুষ,জীবন ও সমাজের বিভিন্ন দিক তথা লড়াইয়ের বিভিন্ন দিককে তুলে ধরা সম্ভব। মূলত বিশ শতকে ক্রীড়া সাহিত্যের যাত্রা শুরু। এই সময় পর্ব থেকে বিভিন্ন সাহিত্যিক ক্রীড়াকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করেছেন। তবে আজকের একবিংশ শতকে ক্রীড়া সাহিত্য বলতে আমরা যা বুঝি সে ধরনের সার্থক ক্রীড়া সাহিত্যের সূত্রপাত মতি নন্দীর হাত ধরে। তাঁর সৃষ্ট 'কোনি' হয়ে উঠেছে সর্বকালের লড়াইয়ের অন্যতম সেরা প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্র। উপন্যাসের মতোই বাংলা সাহিত্যে খেলা কেন্দ্রিক ছোটগল্প রচনা করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রমথ চৌধুরী, রূপক সাহা, চারুচন্দ্র দত্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিত্বরা। তাদের সৃষ্টি বিভিন্ন দিক থেকে আলোচিত হলেও তাদের ক্রীড়াকেন্দ্রিক সাহিত্য রচনার দিকটি এ পর্যন্ত আলোচিত হয়নি। বলা ভালো দীর্ঘদিন ধরে এ জাতীয় সাহিত্য ছিল অনালচিত এক অধ্যায়। বর্তমানেও দু-একজন সাহিত্যিকের রচনা ব্যতীত ক্রীড়া সাহিত্যের সংখ্যা অত্যন্ত কম। অন্যদিকে ক্রীড়া তথা ক্রীড়া সাহিত্য কেন্দ্রিক অল্পবিধ আলোচনা হলেও কথাসাহিত্যে ক্রীড়া বিষয়টি কীভাবে উঠে আসছে, কীভাবে লেখকেরা ক্রীড়াকে বিভিন্ন কৌণিক বিন্দু থেকে ব্যবহার করছেন তার কোনো রকম আলোচনা এযাবৎ হয়নি। সে কারণেই ক্রীড়ার একটি ভাগ হিসেবে লোকক্রীড়াকে আলোচনার বিষয় রূপে বেছে নেওয়া এবং এই লোকক্রীড়াকে কেন্দ্র করে বাংলা তথা বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য আলোচনার পরিকল্পনা করা। আর এই বিষয়টিকে সম্যক রূপে তুলে ধরতে কথা সাহিত্যের কনিষ্ঠ শাখা ছোটগল্পের আশ্রয় গ্রহণ। আলোচনার সংক্ষিপ্ততার কারণে আমরা নির্দিষ্ট কিছু লেখকের নির্দিষ্ট কিছু ছোটগল্প আলোচনার মাধ্যমে বাংলা ছোটগল্পে লোকক্রীড়ার স্বরূপ ও লোকক্রীড়ার ঐতিহ্যের দিকটি তুলে ধরার চেষ্টা করবো। এই নির্বাচিত গল্পগুলি হল— প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর 'নবাবদের পায়রা ও ঘুড়ি ওড়ানো', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বর্শেলের বিরম্বনা', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'বাঁশবাজি'। এই গল্পগুলি নির্বাচনের কারণ এই তিনটি গল্পে তিনটি বিভিন্ন দিক থেকে ক্রীড়া ও মানব জীবনের সমীকরণ প্রকাশিত হয়েছে।

গল্পগুলি আলোচনার পূর্বে আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন প্রাচীন বাংলার জীবন ছিল গ্রামীণ সংস্কৃতিকেন্দ্রিক। সেখানে লোকজ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রাধান্য পেয়েছে। মানুষ যখনই নগর অভিমুখী হয়ে উঠেছে তখনই বদলেছে তার জীবনযাত্রা। সময়ের পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয়েছে আর্থসামাজিক জীবন। গ্রাম বাংলার সহজ পরিবেশে পাওয়া প্রকৃতির সহজ উপাদানের সুলভতা হারিয়েছে, কমেছে সময়। ধীরে ধীরে প্রবেশ করেছে নিয়ম-নীতির বাহুল্য। বদলেছে লোকক্রীড়া। ক্রমশ হারিয়েছে লোকক্রীড়াগুলি। প্রাধান্য পেয়েছে নাগরিক ক্রীড়া। সাহিত্যেও বৃদ্ধি পেয়েছে ক্রিকেট, ফুটবল, বক্সিং, সাঁতারের মতো খেলা। এর অন্যতম কারণ হল, ক্রিকেট ফুটবলকে কেন্দ্র করে পেশা ভিত্তিক জীবনযাপনও সম্ভব, যার সুযোগ লৌকিক ক্রীড়ায় কম।

আলোচ্য গল্পগুলিতে 'খেলা' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রতিটি খেলাই চরিত্রের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গল্পগুলিতে শুধু খেলার বিবরণী দেওয়া হয়নি, তার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে খেলোয়াড়ি মানসিকতা বা স্পোর্টসম্যান স্পিরিট, কখনো দেখানো হয়েছে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার অভাবে জীবন বাজি রাখার মত মনোভাব, কখনোবা সারাজীবন না ভোলার মত ক্রীড়া কৌশল। অভিধানে ক্রীড়া শব্দটির অন্যতম প্রতিশব্দ 'কৌশল'। কৌশল বা কসরৎ

যেকোনো খেলারই অপরিহার্য অঙ্গ। প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর ‘নবাবদের পায়রা ও ঘুড়ি ওড়ানো’ যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বড়ে মিয়ার শিক্ষা ও শিসের কায়দায় পায়রারা একে একে যা খেলা দেখিয়েছে তা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ফ্রেম রচনা করেছে—

> “বড়ে মিয়ার শিসের বিরাম নেই। আর এক শিসে সাদা পায়রার দল ভেঙে লাইনবন্দি হয়ে একটার পর একটা লম্বা হয়ে উড়ে ক্রমে লাইনের দুই মুখ জুড়ে বিরাট একটা পদ্মের মালার মতন হয়ে গেল, দেখতে দেখতে সেই মালার মাঝখানের শূন্য জায়গায় এসে ঢুকল কালো পায়রার দল, মনে হতে লাগল, যেন সাদা ফ্রেমে বাঁধানো একদল কালো পায়রার ছবি দেখছি। দু-দল বিপরীত মুখে উড়তে থাকায় চোখে কীরকম ধাঁধা লেগে যায়, বেশিক্ষণ সেদিকে চেয়ে থাকা যায় না।”[৩]

সঠিক কৌশলে খেলা কতটা মনোমুগ্ধকর হতে পারে, হতে পারে সঠিক শিক্ষা ও প্রচেষ্টার সার্থক রূপায়ণ, তা এখান থেকে সহজে বোঝা যায়। অন্যদিকে গল্পে বর্ণিত হয়েছে ঘুড়ির খেলা। আমাদের ছোটবেলায় ছাদে ছাদে খেলা ঘুড়ির লড়াইও যে হতে পারে কৌতুকপ্রদ ও অসামান্য কৌশলী মনোভাবের পরিচয়ক লেখক তা অনবদ্যভাবে গল্পে তুলে ধরেছেন। অর্জুন যেমন চক্রব্যূহে প্রবেশ করে বেরোতে পারত, ঠিক তেমনি সঠিক কৌশল জানলে ঘুড়ির চক্রব্যূহ ভেদ করেও ফিরে আসা যায়, ভন্ডুল করে দেওয়া যায় প্রতিপক্ষ ঘুড়ির প্যাঁচ। লেখক গল্পে সেই ওস্তাদ খেলোয়াড়েরই ছবি এঁকেছেন। পায়রার মতো ঘুড়ির খেলার বর্ণনা থেকে লেখকের খেলা সম্পর্কিত ধারণা, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের কথা সহজেই অনুধাবন করা যায়। ঘুড়ি খেলার একটি বর্ণনা তুলে ধরা হচ্ছে—

> “ঘুড়ি ওড়ানোর মধ্যেও এত কারিগরি আছে, এর আগে তা দেখা তো দূরের কথা, শুনিইনি। সেখানে একজন লোক ছিল, যাকে একসঙ্গে দশজন মিলে আক্রমণ করলেও–অবশ্যি ঘুড়ি-সুতো দিয়ে, সে অন্য কারুর ঘুড়ির সুতোয় নিজের সুতো না ঠেকিয়ে নিরাপদে বার করে নিয়ে আসতে পারত। তার আক্রমণ করবারই সে কত রকমের কায়দা–কখনো বা একসঙ্গে, কখনো বা এখানে একটা, ওখানে একটা, প্রত্যেকেই নিরপেক্ষ উদাসীনভাবে যেন উড়তে-হয়, তাই-উড়ছি গোছের- এমন সময় হঠাৎ একটা ঘুড়ি ছুটে এসে আক্রমণ করতে গেল, তাকে কাটিয়ে বেরোনোমাত্র ঠিক আরো দুটোর সামনে, কিন্তু আক্রমণের সমস্ত কায়দা ব্যর্থ করে প্রতিবারই সে ব্যক্তি নিজের ঘুড়িকে বাঁচিয়ে নিয়ে আসতে লাগল।”[৪]

গল্পকার আবার অন্যত্র লিখেছেন–

> “পূর্বোক্ত ব্যক্তি যেমন পলায়নের ওস্তাদ ছিল, এ ছিল তেমনি প্যাঁচ ভণ্ডুল করে দেবার ওস্তাদ। এর সঙ্গে প্যাঁচ খেলতে গেলেই সে অপর ব্যক্তির সুতোয় নিজের সুতো দিয়ে এমন একটা ফাঁস লাগিয়ে দিত যে, কারুর ঘুড়িই কাটত না, অবশেষে টানামানি হওয়া ছিল অনিবার্য। টানামানির দৃশ্যটা ছিল ভারী কৌতুকপ্রদ, এবং প্রতিবারই সে অন্য পক্ষের ঘুড়ি ছিঁড়ে আনতে পারত।”[৫]

খেলা বিশুদ্ধ আনন্দের জগত। শিশুদের জীবনে এই খেলায় কখনো হয়ে ওঠে কৌতুকের রসদ। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বর্শেলের বিরম্বনা’ গল্পে সে চিত্রই ফুটে ওঠে। গল্পের শুরুতেই লেখক কৌতুকের আবহাওয়া তৈরীর চেষ্টা করেছেন ‘বর্শেল’ শব্দটির অর্থ প্রকাশের মাধ্যমে। লাঠি চালাতে পটু ব্যক্তি ‘লেঠেল’ বলে পরিচিত হলে বর্শি ও ছিপ দিয়ে মাছ মারতে পটু ব্যক্তির পরিচয় হবে বর্শেল। আবার লাঠি হাতে ঘুরলেই যেমন সকলে ‘লেঠেল’ হয়ে যায় না, ঠিক তেমনি ছিপ দিয়ে মাছ ধরলেই সে ‘বর্শেল’ হয়ে যায় না। অনবদ্য এবং যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা। গল্পে প্রসিদ্ধ ‘বর্শেল’ রূপে পরিচিত রামহরি হোড়। মাছ ধরার প্রভূত জ্ঞান ও কৌশল থাকা সত্ত্বেও নিখাদ আনন্দ করার ক্ষমতা তার নেই। অন্যদিকে মাছ ধরাকে আনন্দ উৎসবের সমতুল্য করে তুলেছে হাবুল, সন্তু, পচারা। তাই মাছ ধরতে বসে কখনো তারা চিৎকার করে ওঠে, কখনো তারা কাঁকর

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 01
Website: https://tirj.org.in, Page No. 01 - 05
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

চুরি করে খায়, কখনো তারা বর্শি ফেলে উঠে যায়। মাছ ধরার সর্ববিধ জ্ঞান তাদের নেই, কিন্তু তাদের রয়েছে শৈশব। তাইতো রামহরি জ্যাঠার বর্শি বিঁধে সুতো কেটে পালিয়ে যাওয়া মাছের সঙ্গে রীতিমতো কসরৎ ও বুদ্ধির মাধ্যমে পরনের কাপড়ে জাপটে মাছ ধরে ফেলে তারা। যার ওজন সের পাঁচেক। এর অংশবিশেষ অবশ্যই অভিজ্ঞ রামহরি জ্যাঠার বাড়ি পৌঁছে যায়। এখান থেকে আমরা বলতেই পারি–

"যে কসরতে শরীর ও মন স্ফূর্তি পায় ও আনন্দিত হয় তা-ই খেলা।"[৬]

লোক জীবনের অন্যতম একটি খেলা বাঁশবাজি। পূর্বেকার দিনে বিভিন্ন মেলায় বাঁশ নিয়ে খেলা প্রত্যক্ষ করা যেতো। বর্তমানে এ খেলাটি বিশেষ লক্ষ করা যায় না। খেলাটি অত্যন্ত দক্ষতার, একটু সরে গেলেই জীবন পর্যন্ত সংশয় হয়ে ওঠে। খেলাটির মাধ্যমে আর্থসামাজিক চিত্র পরিষ্কার ভাবে ফুটে ওঠে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'বাঁশবাজি গল্পটি এমনই এক চরিত্রের অর্থ উপার্জন ও সন্তানের স্বাভাবিক জীবন বিঘ্নিত হওয়ার করুন কাহিনি। খেলা যে কখনো নির্মল আনন্দের পাশাপাশি কঠিন ও কঠোর বাস্তবকেও তুলে ধরতে সক্ষম হয়, এ গল্প তারই নিদর্শন। মন্তাজের পেটের ওপর রাখা বাঁশের অপরপ্রান্তে ঘুরতে থাকে তার ক্ষতবিক্ষত ছেলে ইন্তাজ। বাপের দুর্বল শরীর পারে না আশ্রয় দিতে। দূরে ছিটকে পড়ে ইন্তাজ। মন্তাজের চোখ শূন্য মগের দিকে —

> "অভ্যাসে সবকিছুই সওয়ানো যায়, শুধু বুঝি ক্ষুধাকেই বাগ মানানো যায় না। বাঁশ, বাহু, ছেলে, ঘা–সব কিছুরই মুখোমুখি দাঁড়ানো যায় একমাত্র অভ্যাসের সাহসে–শুধু ক্ষুধাটাই দুর্বিনীত, ক্ষমাহীন।"[৭]

পেট ও সংসার চালানোর তাগিদে লোকক্রীড়াও হয়ে উঠতে পারে জীবিকা অর্জনের অন্যতম মাধ্যম।

বর্তমান বিশ্বে ক্রিকেট ফুটবলের মতো খেলাকেই মানুষ পেশা হিসেবে গ্রহণের চেষ্টা করে। কিন্তু এক কালে আর্থসামাজিক জীবনে বিধ্বস্ত মানুষের পেশা ছিল লোকক্রীড়াই। সেকালে উপার্জন ছিল স্বল্প, যা আজকের পেশা ভিত্তিক খেলায় উপার্জনের তিনভাগের এক ভাগও নয়। ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার ভিড়ে হারিয়ে যেতে বসেছে লোকজ জীবনের আনন্দের অংশীভূত খেলাগুলিও। আজকের ক্রীড়াকেন্দ্রিক ব্যবসা ও রাজনীতির যুগে মুক্তির বাতাস আনতে পারে এসব লোকক্রীড়াই। আত্ম প্রতিষ্ঠার ইঁদুর দৌড় থেকে সরে ক্রীড়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য যে আনন্দ তা চিহ্নিত করতে পারে এই হারিয়ে যেতে থাকা খেলাগুলিই। ঠাসাঠাসির ভিড়ে আজ শিশুদের নেই খেলার মাঠ। আজকের শিশুদের কাছে খেলা মানে বিভিন্ন ধরনের ভিডিও গেমস। এক্ষেত্রে শিশুর শৈশবকে রক্ষা করতে পারে এবং শিশুর মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটাতে পারে এই ক্রীড়াই। ক্রীড়ার মাধ্যমে একসঙ্গে আনন্দ, কল্পনাবোধের বিকাশ, শৃঙ্খলাবোধ ও চরিত্র গঠন সম্ভব। আর বিশুদ্ধ আনন্দের জগতে এই লোকক্রীড়াগুলির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আলোচ্য বাংলা ছোটগল্পগুলি এই আনন্দেরই সন্ধান দেয়। লোক মানুষের দৈনন্দিন জীবনচর্যার পরিচয় এই খেলাগুলি লোকজীবনেরই একান্ত নিজস্ব সম্পদ, লোকসংস্কৃতির ধারক ও বাহক। সে দিক থেকে বিচার করতে গেলে নাটক, কবিতা বা কথার মতই এই ক্রীড়াগুলিও যুগ যুগ ধরে লোক ঐতিহ্যকে বহন করে চলে। আর এই লোকক্রীড়াকেন্দ্রিক গল্পগুলির মাধ্যমে সংরক্ষিত হয় সেই ঐতিহ্য। সে দিক থেকে বিচারে এই গল্পগুলি শুধুই ক্রীড়া সাহিত্যের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ না থেকে হয়ে ওঠে লোক মানব ও লোকজীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

Reference:

১. আলম, ড. জিয়াউল, লোকক্রীড়া: শরীরচর্চা ও সামাজিক মূল্য, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, লোক দর্পণ, পৃ. ১৩

২. তদেব, পৃ. ১৩৫

৩. আতর্থী, প্রেমাঙ্কুর, 'নবাবদের পায়রা ও ঘুড়ি ওড়ানো', কিশোর গল্প খেলা (সম্পা. অশোক সেন), কলকাতা, শিশু সাহিত্য সংসদ, জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ৪৭

৪. তদেব, পৃ. ৪৮

৫. তদেব, পৃ. ৪৯
৬. তদেব, পৃ. পাঁচ
৭. সেনগুপ্ত, অচিন্ত্য কুমার, ‘বাঁশবাজি’, খেলা আর খেলা (সম্পা. সিদ্ধার্থ ঘোষ), কলকাতা, ভারবি প্রকাশনী, পৃ. ২০৩-২০৪